রবীন্দ্র গুহ-র সঙ্গে বোধপ্রবাহ বিষয়ক কিছু কথাবার্তা

(একজন ডায়াসপোরা স্বীকারোক্তি)

আলাপচারিতায় অজিত রায়

বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত আঙনায় যখন দিক-বদলের রীতিনীতি তথা ছুঁৎমার্গের তুমুল দইমুচুল চলছিল— রোমান্টিসিজম, র‍্যাশনালিজম আর শূন্যতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে হৃদয়বোধ ও বাস্তববাদের, এবং বাঙালি পাঠক যখন একঘেয়েমির প্রাতঃরাশে হতাশ ক্লান্ত বিরক্ত, ঠিক সেইতম মুহূর্তে নতুন নির্মাণশৈলী ও আঙ্গিকের সামর্থ্য নিয়ে, বাংলা গদ্যের মঞ্চে রবীন্দ্র গুহ হাজির হন, যাকে বলা যায় 'সাড়ম্বর আবির্ভাব'। একদা এরকমই সাড়ম্বর আবির্ভাব ঘটেছিল সতীনাথ ভাদুড়ী ও কমলকুমার মজুমদারের। অজস্র প্রাচীন হাজা-পচা নিয়ম ভঙ্গ করে নতুন নিয়ম গড়ে তাঁরা বাংলা গদ্যকে গর্বিত ও ধনী তথা পাঠককে ঋদ্ধ ও স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের মতোই রবীন্দ্র গুহ তাঁর গদ্যে— গল্পের ভূগোল, নতুন ভাবনা, টানটান বুনো উৎক্ষিপ্ত জঞ্জালময় জীবনের হাহাকার, নরনারীর নতুনতর সম্পর্ক, আসলি চোখের জল ও আঁতাতহীন হিংস্রতার পশরা নিয়ে এক কালকেতুর ভাঁতি উঠে এসেছিলেন সমুদ্রের ধুরা থেকে।

অজিত রায়।। প্রায়ই শোনা যায় আপনি বলেন, উত্তর আধুনান্তিকতার কথা— অর্থাৎ ফিউচার কালচারাল ট্রুথ। পোস্ট কলোনিয়ালিজম পোস্ট মর্ডানিজম থেকে তা কতটা তফাৎ?

রবীন্দ্র গুহ।। *তড়িঘড়ি করে বলছি, শিড়দাঁড়াটা ভাঁজ করে থেকো না, সোজা করে শোন। ব্যালেন্সড রিয়ালিটি কি জানো! নিষ্কন্টক বাঁচার খাঁটিত্ব। বিশ্বায়নের বাজারে অগণিত মজা। তারও বেশি এ্যান্টি রিয়ালিটি— গাণিতিক অতিসংকট। দ্যাখো, সাজিয়ে-গুছিয়ে বলা যায় না। দু-দশক আগেও আমাদের জীবন ছিল ফোঁফরা জীবন। এখন আমরা ছলাৎ মেরে মেরে চলি। পোস্ট-কলোনিয়াল তথা, পোস্ট মর্ডানিজম চিন্তার কলাকার ছিল হোমি ভাবা, গায়ত্রী স্পিভাক চক্রবর্তী, অ্যাশক্রফ্‌ট— এ-সব তো তুমি জানোই। সেসব ব্ল্যাক-ম্যাজিক কালখণ্ডের ব্যালেন্সশিট থেকে কাট্টি হয়ে গেছে। এখন লিটারারি জাস্টিস-পোস্ট মর্ডানিজম—*

উত্তর আধুনান্তিকতা। সাজানো বাগানের পরের পরের স্টেশান মহাশূন্যে ছলাৎ মারো। নানামাত্রিক জীবন— সম্পূর্ণ ভিন্ন দুঃখ, বাসনা, কুণ্ঠা, নৈরাশ্য, ভূমির গন্ধ। আজকের মানুষের ভাবনা আচার-আচরণ কতটা সঙ্গতিপূর্ণ? আদৌ হবে কি? সেই ভঙ্গুর, খণ্ডিত ও নিশ্চয়তার জীবনের কথা ভাবতে কেমন লাগে?

অজিত রায়।। আপনি তো আড়েধরে শেষ দিনটির কথাই বল্লেন, সবকিছুর নয়। ঋতুচক্রের নিয়ন্তা সূর্য— সৌরজগতের অভিভাবক— পূর্ব থেকে পশ্চিমে যার আহ্নিক গতি। ধরুন, ক্রমশ মনুষ্য জীবনে জট পাকল, পাপ ও অধর্ম বাড়ল— সূর্যের দাপটে পৃথিবী ডিগবাজি খেল—

রবীন্দ্র গুহ।। *না না। তা নয়, আমি মনুর কথাও বলছি না, খোদাবন্দ ঈসা মহীহ-র কথাও বলছি না— যে অন্তিমকালে এসে বলবে 'আমিই রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু, তোমরা তেজে জেগে ওঠো।' আমি বলছি বিজ্ঞানের কথা। মহাকাশে অন্য জগতের ঘর খোজার কথা। যেখানকার প্রকৃতি অন্যরকম, রুচি, ভাষাসাহিত্য অন্যরকম। এইরকম ধারণা নিয়ে কবি সমীর রায়চৌধুরী হাওয়া ৪৯-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন— 'ভবিষ্যতের মানুষ, তার জীবনযাপন, ভাষাসাহিত্য'—*

অজিত রায়।। বাংলা সাহিত্যে আপনার মতে উত্তর আধুনিকতার বহুমুখী যুগলক্ষণ কার রচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়?

রবীন্দ্র গুহ।। *অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস। গল্পের কথা ধরলে কমলকুমার মজুমদারের ফৌজ-ই-বন্দুক এবং সমীর রায়চৌধুরী বাস্তবতার অবাস্তব গল্প গান্ধারী-পুং। বিদেশে প্যারালাল টেক্সট নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন আর্ণল বোনেট, উইলিয়াম ফকনার। উত্তর আধুনিকতার মূল চালিকা শক্তি 'মুক্ত ভাবনা'। ব্যাপারটি খুব হুঁশিয়ারভাবে বাংলা সাহিত্যে কেনাবেচার পর্যায়ে নিয়ে আসে সলমান রুশডি, ঝুম্পা লাহিড়ী, গুন্টার গ্রাস অঢেল খাদ মিশিয়ে।*

অজিত রায়।। একটা ব্যক্তিগত কথা— অভিযোগও বলতে পারেন— *শিকঞ্জের পাখি খামোশ*-এর প্রথম প্রকাশক আমি। আমাকে না জানিয়ে বইটা পুনর্মুদ্রণের জন্য অন্য প্রকাশককে কেন দিলেন?

রবীন্দ্র গুহ।। *বিষয়টি এখানে আলোচনা করা জরুরি? যাইহোক, যখন জিজ্ঞেস করলে বলি। আমার দুটো উত্তর— এক, বইটা মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ*

লোকে খুঁজছে, তুমি রিপ্রিন্ট করছ না। দুই, বইটাতে তুমি উৎসর্গের পাতায় লিখেছ: রবীন্দ্র গুহ-কে রবীন্দ্র গুহ। যদিও এরমধ্যে একটা মজা আছে। আমার হজম হয়নি।

অজিত রায়।। আমাদের নিম সাহিত্য বাংলা ভাষা-সাহিত্যে কতটা প্রভাব ফেলেছে?

রবীন্দ্র গুহ।। *বাংলা সাহিত্যের পিত্তথলিতে লজিক্যাল ক্র্যাক এসেছে। প্রান্তিক মানুষের কথা বলছে অনেকে। অচ্ছুৎ বাংলা কথাবার্তা ঢুকে পড়েছে গদ্যেপদ্যে। পাঠবস্তুতে বাউন্ডারি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিকঠাক কিছুই ঘটে না জীবনে, এমনসব চরিত্র ঢুকে পড়ছে বাংলা সাহিত্যে। অন্ধা তুলসি, এতিমখানার মালিক, বড়বাজারের আড়তদার সূরজলাল অন্যতম চরিত্র হয়ে যাচ্ছে উপন্যাসের। ফ্যালনা মানুষ— যার জিভে আগুন, আগুনের মধ্যে সাপ খেলে— সে কাঁচ চিবোয়, গলগল দুগ্ধ বমন করে। সেই নাথান্‌বাবা রাজনেতাদের গুরু। নিমসাহিত্য একটি গাণিতিক চেতনা। জীবনের কোনো ব্যাখ্যা নেই, কার্যকারণের ভবিষ্যৎ নেই। অনেক তরুণ এসব জোর দিয়ে বলছে। এই মুহূর্তে সবাই বুঝে গেছে— মানব আত্মা + দৃশ্য জগতের আত্মা + জলবায়ু কীটপতঙ্গের আত্মা অভিন্ন। সবাই সরাসরি জেনে গেছে, জগতের যাবতীয় সম্পদের ওপর সকলের সমান অধিকার।*

অজিত রায়।। হাংরি ও শাস্ত্রবিরোধী দর্শন থেকে নিমদর্শন আলাদা কি?

রবীন্দ্র গুহ।। *সম্পূর্ণ আলাদা। আবার নিম সাহিত্য বেত্তান্ত গ্রন্থে এ-বিষয় স্বচ্ছ আলোচনা আছে। আজকাল তো যুগটাই ব্রেন-ইনফেকশনের। বুদ্ধিজীবীরা মর মর হয়ে আছে। রাজনেতাদের তাদের বড় বড় মস্তকগুলি দূষণযুক্ত। প্রশাসনিক কাজে তাদের বড় কদর। এসব কথা নিম লেখকরা আগেই বলেছিল। ইঙ্গিতটা ছিল এইরকম— 'ব্যারেলের ওপর থেকে প্রজাপতিটি উড়িয়ে দিন'। সমাজতান্ত্রিক ভাঁওতা আমরা আঁচ করতে পেরেছিলাম। সুনীল গাঙ্গুলী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ নিম সাহিত্যের সঙ্গে যুতে গিয়েছিল।*

অজিত রায়।। শুনেছি আপনারা কেউ কেউ পুলিশের নজরে পড়ে গিয়েছিলেন?

রবীন্দ্র গুহ।। *হ্যাঁ। ওরা মাঝে মাঝেই ধাতানি দিত। কী সব লিখছেন মশাই, পত্রিকা তো আর পাড়া যাচ্ছে না। জঘন্য ভাষা। আপনাদের নাম শুনলেই নেতা-মন্ত্রীরা ক্ষেপে যাচ্ছে। একটু চেপেচুপে চলুন। টাউনশিপের কেউ কেউ আমাদের নকশালি ভাবত। একটি ছোট নিমবচন উল্লেখ করছি— যা নিয়ে আজও চর্চা হয়—*

জীবনকে অষ্টপ্রহর বিব্রত করুন

সাহিত্য ধর্ষণ সুজনশীল রক্তের উত্তাপ বাড়িয়ে দেয় দশগুণ, আর বলাৎকার সন্দিগ্ধ বুকের ফুসফুসে যৌবনের উত্তপ্ত লৌহশলাকা ঢুকিয়ে দেয় অবলীলাক্রমে-এবম্প্রকার দুর্দ্দান্ত কামিষ্ঠ অনুভূতি নিয়ে যারা শহর-নগরের লোকজনের ভিড়ভাটঠায় ধূর্ত আলো-আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে মানুষ আর মানুষীর শরীর ঘেঁটে খাবলা মাংসল সাহিত্য তুলে নিচ্ছেন এবং স্বচ্ছন্দে তাই সমাজের ভোজনবিলাসীদের বিতরণ করছেন, তাদের কিংবা যারা নিজেদের উঁচু নাকের ডগায় বারংবার জিহ্বার লেহনে উৎকেন্দ্রিক সৎ-সাহিত্যের মাধুর্য চুষে চুষে জীবন যাপনের আভিজাত্যে অভ্যস্ত, তাদের ব্যতিরেকে আর সকলেই নিম সাহিত্যে আসা যাওয়া করিবে।

অজিত রায়।। আপনিতো মাঝে মাঝে লিটারারি-লাইসেন্স, ভাষা-রিলেশন, অরগ্যানিক ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালইজম-এর কথা বলেন। তাই নিয়ে কিছু বলুন।

রবীন্দ্র গুহ।। *জগতকে চেনার অনেক চাবিকাঠি আছে। এই জগত নিয়েই সাহিত্য। এখন যুক্ত হয়েছে মহাশূন্য। অথচ কালখণ্ডের এ-সময় আমাদের সাহিত্যের দিকে তাকালে কী দেখি? থ্যাঁত্‌লানো রাশি রাশি পচনশীল লাশ। বসুর লাশ। মিত্রর লাশ। গাঙ্গুলীর লাশ। বাংলাজারময় লাশ-হি-লাশ। আর ফোঁপানি। 'আমির সঙ্গে আমির' ক্রমাগত বিরোধিতা। লিঙ্গভিত্তিক যাপনসংক্রান্ত পাপবোধ। অলক্ষে অনুকরণের টান। মগজে খিঁচাতানি চলে অনবরত। আমি আমি। সে সে। স্বাধীনতার প্রশ্নই আসে না। পোষ্যদের মুহুর্মুহু স্থা-শক্তির ধমক। ল্যাংগোয়েজ রিলেশনশিপ মানে অখণ্ড যুক্তিবাদ বা দ্য রেজিম অফ ট্রুথ-এর কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে না। দ্যাখো, মনখারাপের ভাষায় দলবাজি করা যায় না। দলবাজিতে রিলেশনশিপ থাকে না তাও নয়। তবু ওরই মধ্যে সাহিত্যকে মগজের ঘিলুর বীভৎসতা থেকে নৈরাজ্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে। লেখক মসিহস্তী নন, মীরমুন্সীও নন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অনেক খাটোয়ার থাকে— থাকে তারা ছদ্মবেশ ধরে আঁকড়ে থাকে লিটল্ ম্যাগাজিনের ঘাঁটি। স্থা-শক্তির রমরমা এই খাটোয়ারদেরদের জন্যই। আজকাল পত্রিকা করাও এক ধরনের খুচরা-পেশা। রিটেল-বিজনেস। পত্র-পত্রিকার দোকানে থাকে টুথপেস্ট-ভুজিয়া-কুরকুরা। এইসব খাস বড় দরবার আবার গদ্যপদ্য-পুস্তকের প্রকাশকও। লেখকদের জেব্-কেটে খরচাপাতি নিয়ে নেওয়া হয়। এসব ক্ষুদে কবিলেখকরা আসে ঝাঁক-পাখির মতো গ্রামগঞ্জ থেকে ফসল কাটা হলে— সঙ্গে পাণ্ডুলিপি, টাকার গুচ্ছ, ছোটোসাইজের ফটো আর সংক্ষিপ্ত জীবন বেত্তান্ত।*

অজিত রায়।। এসব তো আজকাল সব দেশেই হয় আমেরিকান কবি অ্যালেন গিনস্‌বার্গ তাঁর প্রথম ক্ষুদে কবিতার বই গ্যাঁটের পয়সা দিয়ে বের করেছিলেন।

রবীন্দ্র গুহ।। *হ্যাঁ, জেনুইন্‌ভাবে। তাদের লেনদেনে কোন ঘোটালা ছিল না। এখানে অনেক হা-হুতাশের ব্যাপার ঘটে। বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরাতেও তাযই— বিস্তর চিটিংবাজি।*

অজিত রায়।। কবিতায় এত ভিড়, এত নতুন নতুন কথা, ভাষা বদলের চিন্তা, অতিচেতনা, রীতির দিবারাত্রির গঠন-নির্মাণ, দ্বিমুখী রাস্তা, চৌরাস্তা। ছোটোগল্পে নেই কেন?

রবীন্দ্র গুহ।। *নেই বললে যথার্থ বলা হবে না। আছে— অবশ্যই আছে। রসগোল্লা সবার প্রিয় অথচ সে-কাউন্টারে ভিড় কম। জেলেপির কাউন্টারে বেজায় ভিড়। একটা ইকোনমিক্সের ব্যাপার আছে। মডার্ন পরিমণ্ডলে বিস্তর কাজ হয়েছে ফ্রান্সে, ইতালিতে, ইংল্যান্ডে। পোস্টমডার্ন যুগেও কমকিছু ভাঙচুর হয়নি। কর্তৃত্ববাদী চিন্তার জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন রীতি এসেছে, ছাঁচভাঙা হয়েছে, জাং-শব্দকে বাতিল করা হয়েছে। আমরা সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়েছি। আরো পরে পেলাম সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ, সমীর রায়চৌধুরীকে, তোমাকে। একশ্রেণির বড়মানুষের নীতিহীনতা, ফোঁফরা মূল্যবোধ, লোভলিপ্সা, চতুরতা ফাঁস হয়ে গেল। ভিড় আছে। সেই ভিড়ের মসিহস্তীদের নাম করছি না। তালিকাটা বেশ নাদাপেটা। তারা নিত্য প্রসব করছে ত্রিভুজ গল্প < নপুংশক স্বামী, স্ত্রীর বহুগামীতা। চ্যাংড়ামি। খণ্ডযুদ্ধ। বুকে, মুখমণ্ডলে, উরুতে, নিতম্বে জ্বালা, তার বর্ণনা। ছিটেফোঁটা। স্বামীর দুর্বলতার কথা > সবৃত্ত গল্প যুবক ১ যুবতী ৩। ১-রাত অরণ্যে, ১-রাত পাহাড়ে। বিবাহ। বিচ্ছেদ।। ধানুকি গল্প— ইনকেলাবি গল্প— কিমাকার গল্প ইত্যাদি। বুদ্ধদেব টাইপ, শীর্ষেন্দু টাইপ, বিমল কর টাইপ গল্প। গল্পের মুরগি-বাজার।*

অজিত রায়।। প্রায়শই আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ শোনা যায়, আপনার লেখা অত্যন্ত কঠিন...

রবীন্দ্র গুহ।। *জাক দেরিদা, কমলকুমার মজুমদার এবং হাংরির মলয় রায়চৌধুরী সম্বন্ধেও অনেকে এইরকম কথা বলেন। তবু তারা ওঁদের লেখা খুঁজেপেতে পড়েন। আমার লেখাও পড়েন। জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন আমার অন্যান্য বইয়ের বিষয়। ওটাই, হ্যাঁ ওইটাই আমার আইডেন্‌টিটি— আমার কোনো ক্রাইসিস নেই।*

অজিত রায়।। কিছু ঝুরো কথাবার্তা আছে। অনেক জায়গায় আপনি 'শ্রমিক সাহিত্য' কথাটা উল্লেখ করেছেন— শ্রমিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়?

রবীন্দ্র গুহ।। *সাহিত্যের পোর্টফোলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিদেশিরা খনি-শ্রমিকদের নিয়ে লিখেছেন— সে এক ভিন্ন পরিবেশ। ভিন্নজগৎ। অসাধারণ। শলোকভের মাঠময়দানের শ্রমিকদের নিয়ে লেখা কোয়াইট ফ্লজ দ্য ডন, আমাদের দেশে গুণময় মান্না এবং শৈলজানন্দও লিখেছেন। কিন্তু শ্রমিক হয়ে শ্রমিক সাহিত্য কেউ লেখেননি— একমাত্র নিম লেখকরা ছাড়া।*

অজিত রায়।। আপনিতো শ্রমিক ছিলেন না। ম্যানেজমেন্টের লোক। ইস্পাত-কারখানার এতসব জানলেন কী করে?

রবীন্দ্র গুহ।। *ম্যানেজমেন্টের লোক হলেই ঠান্ডাঘরে বসে থাকে, সিগার ফোঁকে আর দমন-পীড়ন করে একথা ঠিক নয়। আমরা ফার্ণেসের কাজ করতুম। রেলট্রাকে ডি-রেলমেন্ট তুলতাম। মধ্যরাতে লোকো চালিয়ে চলে ডাম্পিং-ইয়ার্ড। দিবারাত্রি কংক্রিটইংয়ের কাজ চলছে, সেখানেও থাকতে হতো। বাইশ দিনের ধুঁয়া বন্ধ, চাক্কা-বন্ধ দেখেছি। ঘেরাও দেখেছি। শ্রমিকরা অফিসারের গায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছে— টাউনশিপে ন্যাংটো করে দিয়ে তাড়া করতেও দেখেছি। আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল-ম্যানেজমেন্টের ছাত্র— ডাউন দ্য লাইনম্যান। শ্রমিক-চিত্ত জয় করা খুব কঠিন ছিল না। তাছাড়া বিহেভিরিয়াল সায়েন্স এবং মার্কস পড়া। সেল্ফ এক্চুয়ালাইজিং। নিজের ছকটা বোঝা স্পষ্ট ছিল। ভেদাভেদ মানতাম না। একটা চমৎকার ঘটনার কথা বলছি শোনো। আমি তখন ইস্পাত কারখানায় কাজ করি। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটল। কোনো শ্রমিক নয়। একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার, নাম সঞ্জয় সেন, খুব আঘাত পেল মনে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাঘুরি থাকল। মুখময় দাড়ি, উল্‌ঝা-উল্‌ঝা চুল। একদিন কারখানার গেটের সামনে থম্ মেরে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি শুধালাম— কার জন্য অপেক্ষা করছেন? সে বলল— 'কারো জন্য নয়। এম্নি দাঁড়িয়ে আছি। ভাবছি, কীভাবে একজন নিষ্ঠাবান শ্রমিক হওয়া যায়!'*

অজিত রায়।। পুরস্কারের জন্য আপনার কাছে যদি আপনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি চাওয়া হয়, কোন উপন্যাসখানি দেবেন?

রবীন্দ্র গুহ।। *আমি তো ভিড়ের লেখক নই। সে অর্থে, পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য আমার কোনো গ্রন্থ নেই—*

অজিত রায়।। *সূর্যের সাত ঘোড়া* এবং *শিকঞ্জের পাখি খামোশ* তো যথেষ্ট প্রশংসিত উপন্যাস...

রবীন্দ্র গুহ।। *বাংলাবাজারে অচল।*

অজিত রায়।। উপাদান নির্বাচনে আপনার প্র্যায়রি কী?

রবীন্দ্র গুহ।। *চিন্তার সামাজিকরণ— Social is at of thinking। বিষয় বৈচিত্র্যে ভিন্নতা, ভাষার অভিনবত্ব। বাস্তব চরিত্র গঠন। সিচুয়েশনকে মজবুত করার জন্য যে-কোনো ভাষা প্রয়োজন তাই গ্রহণীয়— জংলা ভাষা, জাদুভাষা, তিক্ত ভাষা, তা খুঁজে বার করা জরুরি। আসল উদ্দেশ্য পরিবেশ এবং ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। ভাবুকতার ছড়াছড়ি নয়—*

অজিত রায়।। আপনার লেখায় প্রচুর ম্যাজিক রিয়ালিজম পাই। মগজে ওগুলির উৎপত্তি কীভাবে হয়?

রবীন্দ্র গুহ।। *হ্যাঁ, এ-কথা সত্য আমি ম্যাজিক রিয়ালিজমের ভক্ত। কিন্তু তাই বলে রজ্জুকে সর্প মনে করি না। মন-মগজ ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রসব করে না। ম্যাজিক রিয়ালিজম কোনো অলীক ভাবনার বিষয়ও নয়। যা কুহক, যা মায়া— যা সত্য তাই মায়া, যা পার্থিব তাই নিরাকার। বিষয়টি প্রথম সবার গোচরে আনেন Franz Roh। পরবর্তীকালে জার্মানিতে চিত্রশিল্পীরা বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু করেন। কালক্রমে আমেরিকা হয়ে ভারতে আসে। যদিও অনেকের মতে ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে জাদুবাস্তবতা ছিলই। নারদের শূন্যপথে গমনাগমন। দশাননের বিচিত্র রূপ ধারণ। দীঘির পাড়ে ভূত ডাংগুলি খেলে। আকাশে ললছৌয়া চাঁদ। কুম্ভকর্ণের অতক্ষণ ঘুমোনো কি লজিক্যাল। আমার জাদুবাস্তবতা পরস্পরবিরোধী অসম্ভাব্য ঘটনা— যা সুসঙ্গত, সমানুপাতিক। জীবন সত্যকে ক্ষুরধার করার জন্য, বাস্তব করার জন্য, সামাজিক করার জন্য ম্যাজিক রিয়ালিজম প্রয়োজন। চমকপ্রদ করার জন্য বা বাহিনির মেদ বাড়ানোর জন্য নয়।*

অজিত রায়।। বাংলা সাহিত্যের পাঠক আপনাকে একজন ডায়াসপোরা লেখক বলে জানে। এরকম ধারণা হল কেন? আপনি নিজে কী বলেন?

রবীন্দ্র গুহ।। *আমি একজন দূষণযুক্ত দগ্ধ মানুষ। জীবনের নানা টানাপোড়েনে সারা বাদ-বাংলা ঘোরা। আমার অধিকাংশ লেখালেখির ব্যাকড্রপ হরিয়ানা, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি— সেখানকার মানুষের রহন-সহন, হিংসা, প্রেম, দমন-পীড়ন— ঝাঁঝালো ধুলো, মাটি, আকাশ, বন, কীটপতঙ্গ, জাদুটোনা, সূর্যতাপ, দিবাবসানের শীত আমার গল্প-উপন্যাসের ঘটনাকে, পরিবেশকে, বাস্তব করে তুলেছে। এইসব মানুষের জীবন বেজায় ধারাল, সামাজিক কিংবদন্তিতে ঠাসা। যা আমার জীবনেও ঢুকে পড়েছে পঞ্চতন্ত্রের গল্পের মতো। তাছাড়া আমার ঠিকঠাক ঠায়ঠিকানা নেই। পেহেচান্ নেই। ভালগার ডায়াসপোরাদের মতো লাথ্ড়া খাওয়া— সীমা ভেঙে অনন্তে ছড়িয়ে পড়া। যখন অবাস্তব নৈঃশব্দের মধ্যে থাকি নিজের সঙ্গে কথা বলি, আড়বুকো ডায়াসপোরাকে খুঁজি— স্বপ্নের ভিতরে ঢুকে যায় আর একটা স্বপ্ন।*